আনন্দবাজার পত্রিকা
অনলাইন সংস্করণ
২৩ চৈত্র ১৪২৬, সোমবার ■ ৬ এপ্রিল ২০২০

- ৬ এপ্রিল, ২০২০, ১৫:৪০:২১
- **শেষ আপডেট:** ৬ এপ্রিল, ২০২০, ১৬:১৭:৫৩

‘এটা দয়ালু ভাইরাস, তবু মৃত্যুর সংখ্যা বিরাট দাঁড়াতে পারে, সাবধান!’

ইনফ্লুয়েঞ্জা আর করোনাভাইরাস রোগ পুরোপুরি এক নয়। —ফাইল চিত্র

নোভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণে মৃত্যুর হার তো খুব কম। তা হলে সব কিছু লকডাউন করে ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে কেন? এত মারাত্মক কেন বলা হচ্ছে ভাইরাসটাকে? আনন্দবাজারকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে ভয়ের কারণটা জানালেন ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর প্রেসিডেন্ট তথা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োমেডিক্যাল জিনোমিকস্, কল্যাণীর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক পার্থপ্রতিম মজুমদার (ন্যাশনাল সায়েন্স চেয়ার)।

আপনাদের ইনস্টিটিউট কোভিড-১৯ নিয়ে ঠিক কী ধরনের কাজ করছে?

শুধু কোভিড-১৯ নিয়ে তো নয়, যে কোনও ভাইরাস নিয়েই আমরা কাজ করি। কোনও ভাইরাসের কার্যকলাপ, তার সংক্রামিত হওয়ার প্রক্রিয়া, তার সক্ষমতা-অক্ষমতা— এই সব কিছু

নিয়েই আমরা গবেষণা করি। কোভিড-১৯ সম্পর্কেও সেই কাজ আমরা করছি। এর গতিপ্রকৃতি আমরা আঁচ করে ফেলেছি বলতে পারেন।

তা হলে এই নোভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণকে কি এক ধরনের ফ্লু বলেই মনে করবেন? মানে আমি জানতে চাইছি, করোনা কি এক ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা?

ইনফ্লুয়েঞ্জা আর করোনাভাইরাস রোগ পুরোপুরি এক নয়। হ্যাঁ, মিল রয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি এক গোত্রে ফেলা যায় না। গরু আর মহিষ— দুটোই তো গবাদি পশুর মধ্যে পড়ে। কিন্তু প্রজাতি তো আলাদা। ঠিক সে ভাবেই ইনফ্লুয়েঞ্জা আর করোনা আলাদা।

আমেরিকার হাসপাতালে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা চলছে।

আচ্ছা, তা হলে পুরোপুরি এক নয়। কিন্তু কিছুটা মিলও রয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে, সে রকম বলা যেতে পারে।

সে ক্ষেত্রে করোনাভাইরাস রোগ কি এ দেশে মারাত্মক আকার নিতে পারবে? কারণ ফ্লু তো সাধারণত খুব বড় প্রভাব আমাদের এখানে ফেলতে পারে না।

না না, তা নয়। ফ্লু আমাদের এখানে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

কিন্তু ইউরোপীয় দেশে বা আমেরিকায় বা শীতের দেশে ফ্লুয়ের প্রভাব যেমন পড়ে, এখানে কি ততটা পড়ে?

সব রোগেরই তো একটা সিজন্যালিটি রয়েছে। বিশেষ বিশেষ মরসুমে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। আমাদের এখানে ফ্লু জাতীয় রোগগুলো সাধারণত শীতকালে বা বর্ষাকালে ছড়ায়। কারণ ঠান্ডা বা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ওই রোগের জীবাণু বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। শীতের দেশে বছরের অধিকাংশ সময়টা জুড়েই এখানকার চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা। তাই সেখানে হয়তো সারা বছর ছড়াতে পারে। কিন্তু এখানে ফ্লু সে ভাবে প্রভাব ফেলে না বা এটা ফ্লুয়ের দেশ নয়— এ রকম কিছু বলা যাবে না।

অনেকে বলেন, আমাদের দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জার একটা দুর্বল রূপ হানা দেয়। আপনি তা হলে সহমত নন?

দুর্বল মানে কিসের চেয়ে দুর্বল? কোন দেশের তুলনায় দুর্বল?

ধরুন ব্রিটেনের কথাই বলছি অথবা জার্মানি। সেখানকার ফ্লু যতটা শক্তিশালী, এখানেও কি ততটাই? নাকি পরিবেশ বা আবহাওয়ার কারণেই তার চেয়ে দুর্বল?

না না। এ রকম আমি মনে করি না। ওখানকার চেয়ে এখানকার ফ্লু দুর্বল বলে আমার মনে হয় না। এখানেও ফ্লু যথেষ্ট হয়। ১৯১৮ সালে স্প্যানিশ ফ্লু যে ভাবে ছড়িয়েছিল, সেই রকম ভয়ঙ্কর মহামারির আকার ফ্লু আর নেয়নি ঠিকই, তবে এটাও ঠিক যে, ওই রকম মহামারি বার বার হয় না। ওগুলো ওই রকম শতাব্দীতে এক বার-দু'বারই হয়তো আসে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ফ্লু এখানে প্রভাব ফেলে না। আসলে ফ্লুয়ের ভ্যাকসিন বেরিয়ে গিয়েছে। সে ভ্যাকসিন খুব ব্যয় সাপেক্ষও নয়। ফলে অনেকেই এখন ফ্লুয়ের মরসুমে ভ্যাকসিন নিয়ে নেন। তাই ফ্লু-কে এখন অত ভয়ের ব্যাপার বলে মনে হয় না।

জার্মানিতে রাস্তায় চলছে করোনার পরীক্ষা।

আইসিজিইবি, দিল্লির এক গবেষক, দীনেশ গুপ্ত— তিনি একটা পেপার জমা দিয়েছেন। তাতে দাবি করা হচ্ছে যে, আমাদের এখানকার করোনাভাইরাস ব্রিটেনের করোনার মতো অতটা শক্তিশালী নয়। আপনি একমত?

ওই পেপারটা শুধু জমাই পড়েছে, এখনও প্রকাশিত হয়নি। সেটা কি আপনি জানেন?

হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হয়? ওই পেপার ভুল?

না, ভুল বলছি না। এ ভাবে একটা পেপারকে ভুল বলে দেওয়া যায় না। কিন্তু বায়ো-আর্কাইভে যে কেউ এ রকম একটা কিছু জমা দিতেই পারেন। জমা পড়লেই সেটা সর্বৈব সত্য, এমন নয়। ওই পেপারে যা বলা হচ্ছে, সেটা পিয়ার রিভিউ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে এখনও যায়নি। ওই প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বলা যাবে না যে, ওই গবেষণা অভ্রান্ত।

পিয়ার রিভিউ প্রসেসটা কী?

ধরুন, এক জন বিজ্ঞানী বা গবেষক কোনও একটা গবেষণাপত্র জমা দিলেন। এ বার অন্য বিজ্ঞানীরা সেই গবেষণার নানা দিক নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন। কী ভাবে গবেষণাটা হয়েছিল? তার ইনস্ট্রুমেন্ট কী ভাবে সেট করা হয়েছিল? কোন তাপমাত্রায় এই গবেষণা চালানো হয়েছে? —এমন নানা প্রশ্ন উঠতে থাকে। বিজ্ঞানীরা ওই তত্ত্বের নানা দিক খতিয়ে দেখতে থাকেন। সব দিক থেকেই ওই তত্ত্ব বা গবেষণার ফলাফল ত্রুটিমুক্ত কি না, তা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জানা যায়।

কিন্তু আইসিজিইবি যে পেপারটা জমা দিয়েছে, সেটা পিয়ার রিভিউ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে এখনও যায়নি। তাই ওই পেপারকে এখনই ধ্রুবসত্য হিসেবে ধরে নেওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু ব্রিটেনে যত সংখ্যক লোক আক্রান্ত হচ্ছেন, সেখানে যত জন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে চলে যাচ্ছেন বা সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা যত, এখানে তো ততটা নয়। তার প্রেক্ষিতে কি বলা যায় না যে, করোনাভাইরাস এখানে ব্রিটেনের মতো জাঁকিয়ে বসতে পারেনি?

না, এটা এখনই বলা সম্ভব নয়। এর জন্য এখনও অনেক তথ্য লাগবে। তা ছাড়া কয়েকটা মরসুম না কাটলে বলাও যাবে না যে, করোনাভাইরাস এখানে ঠিক কী রকম প্রভাব ফেলল। অনেকে তো বলছেন, গরম বাড়লে করোনার প্রকোপ কমে যাবে। আমি কিন্তু এখনই সেটাও নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব না। সবটাই পর্যবেক্ষণের বিষয়। এত তাড়াহুড়ো করে কোনও উপসংহারে পৌঁছে যাওয়ার মতো সহজ নয় বিষয়টা। এ রকম নানা কথা নানা লোকে বলছেন। কিন্তু সবই আপাতত জল্পনা এবং ধারণার পর্যায়ে। কোনওটাই প্রমাণিত সত্য নয়।

অনেকে বলছেন, নোভেল করোনাভাইরাস ডারউইনের তত্ত্বকে যে ভাবে প্রমাণ করে, সে ভাবে আর কেউ করে না। নিজের প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখাই এই ভাইরাসের মূল লক্ষ্য। তাই নোভেল করোনাভাইরাস যাঁর দেহে সংক্রামিত হয়, তাঁর শরীরে গিয়ে ভাইরাসটা নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে থাকে এবং একই সঙ্গে ভাইরাসটা আবার পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করতে থাকে। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এই লড়াইয়ে নাকি ভাইরাসটা ক্রমশ কম আগ্রাসী বা ম্রিয়মান হয়ে পড়তে থাকে। এই তত্ত্ব কি ঠিক?

এটা নিয়ে আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে? এটা তো সব ভাইরাসের ক্ষেত্রেই সত্যি। যে কোনও ভাইরাসই চায় প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। এবং যাঁর দেহে ভাইরাস সংক্রামিত হল, তাঁকে মেরে ফেলতেও ভাইরাস চায় না। কারণ মেরে ফেললে তো ভাইরাসটার নিজের বংশবৃদ্ধি থেমে যাবে। মানুষের বা প্রাণীর দেহের যে প্রতিরোধ ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা চায় ভাইরাসকে মেরে ফেলতে বা বার করে দিতে। কিন্তু ভাইরাস চায় ওই প্রতিরোধ ক্ষমতাকে রুখে দিয়ে নিজে বেঁচে থাকতে, আবার যাঁর শরীরে ঢুকেছে, তাঁকেও বাঁচিয়ে রাখতে। আপনি ঠিকই বলেছেন। নিজের প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই ভাইরাস এটা করে।

চিনের হাসপাতালে খতিয়ে দেখা হচ্ছে আক্রান্তের রিপোর্ট।

তা হলে মোটামুটি সব ভাইরাসের আচরণই এ রকম? নোভেল করোনা একাই এ রকম, তা নয়?

নোভেল করোনাভাইরাস একটু বেশিই দয়ালু বলতে পারেন। এটা ঠাট্টা করে বলছি না, সত্যিই নোভেল করোনাভাইরাস কিছুতেই হোস্টকে (যার শরীরে বাসা বেঁধেছে) মারতে চায় না। সে চায়, সংখ্যায় যত বেশি সম্ভব বাড়তে। আর, হোস্টকেও বাঁচিয়ে রাখতে। তাই, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার কিন্তু খুব কম। যত জন আক্রান্ত হচ্ছেন, তার মধ্যে ২ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশের মৃত্যু হচ্ছে। আপনি মনে করে দেখুন, সার্স যখন ছড়িয়েছিল, মৃত্যুর হার কত ছিল? ১০ শতাংশ। মার্সে মৃত্যুর হার কত ছিল? ৩৪ শতাংশ। নোভেল করোনায় সেটা মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশ। এটা সত্যিই ডারউইনের তত্ত্বের একটা অসাধারণ প্রতিফলন।

মৃত্যুর হার ২-৩ শতাংশ আপনি বলছেন বটে, কিন্তু আমাদের দেশে মৃত্যুর হার তো তার চেয়ে বেশি বলে মনে হচ্ছে। মানে আক্রান্তের সংখ্যা যত, কোনও রাজ্যে তার ৭-৮ শতাংশ লোক মারা যাচ্ছেন, কোনও রাজ্যে ১০ শতাংশের বেশি।

এইখানেই হিসেবের গন্ডগোলটা। মৃত্যুর হারটা আপনি কিসের ভিত্তিতে হিসেব করছেন? আক্রান্তের সংখ্যার ভিত্তিতে করছেন। আসলে আক্রান্তের আসল সংখ্যা আমরা বুঝতেই পারছি না। যাঁদের মধ্যে নানা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে, তাঁদের একটা অংশ বা অনেকে হাসপাপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন। পরীক্ষার পরে বোঝা যাচ্ছে তাঁদের করোনা হয়েছে কি না। কিন্তু এই

প্রক্রিয়ায় আসল সংখ্যা বোঝা যাবে না। কমিউনিটি টেস্টিং দরকার। যত বেশি টেস্ট হবে, তত স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে, কত জন নোভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। অনেকেই আক্রান্ত, হয়তো আপনি বা আমিও আক্রান্ত। কিন্তু সবার শরীরে উপসর্গ দেখা দেয় না। তাই আক্রান্ত হয়েছি কি না, বোঝা যাচ্ছে না। আক্রান্তের সংখ্যা দেখে মৃত্যুর হার হিসেব না করাই ভাল। যেখানে কমিউনিটি টেস্টিং ভাল ভাবে হয়েছে, সেখানকার তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে ২ থেকে ৩ শতাংশ লোক মারা যাচ্ছেন।

একটা গবেষণা বলছে যে, ভারতীয়দের জিনোমে একটা নির্দিষ্ট আরএনএ রয়েছে, যার সঙ্গে লড়াই করা কোভিড-১৯-এর পক্ষে খুব কঠিন হচ্ছে?

আমি জানি এটা কোন গবেষণায় বলা হচ্ছে। আইসিজিইবি, দিল্লির যে গবেষণাপত্রের কথা আপনি বলছিলেন, ওটাতেই এই কথা বলা হচ্ছে। ভাইরাল আরএনএ-টাকে একটা মাইক্রো আরএনএ ধ্বংস করে দিচ্ছে— এই রকম দাবি করা হয়েছে। কিন্তু সেটা এখনও প্রমাণিত হওয়া বাকি। এখনও পিয়ার রিভিউয়ের মধ্যে আনাই হয়নি ওই পেপারটাকে। আনা হলে আমরা প্রশ্ন করতে পারব। ভাইরাল আরএনএ-কে যে মাইক্রো আরএনএ ধ্বংস করে ফেলছে, সেটা টেস্ট টিউবের মধ্যে দেখিয়ে দিতে হবে। অথবা যাঁরা কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের শরীরে কি ওই আরএনএ-টা নেই? থাকলে সে ব্যর্থ হচ্ছে কেন? এগুলো পরীক্ষা করে দেখার দরকার।

ওই পেপারেই বলা হচ্ছে যে, করোনাকে শ্বেতাঙ্গদের রোগ বলা যেতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই সহমত হবেন না?

না না। এত তাড়াতাড়ি এ রকম বলে দেওয়া সম্ভব নয়।

আচ্ছা, একটা কথা বলুন তা হলে। আপনি বলছেন, কোভিড-১৯ খুব দয়ালু ভাইরাস। সে কিছুতেই হোস্টকে মারতে চায় না। তাই মৃত্যুর হার ২-৩ শতাংশ। তা হলে নোভেল করোনাকে এত ভয় পাওয়ার কী আছে? এটাকে এত মারাত্মক মনে হচ্ছে কেন? এর জন্য গোটা দেশ বা গোটা বিশ্বকে লকডাউনে যেতে হচ্ছে কেন?

কারণ, এই ভাইরাসের সংক্রামিত হওয়ার প্রবল ক্ষমতা। এই ভাইরাস যত সহজে বা যত দ্রুত সংক্রামিত হতে পারে, অন্য অনেক ভাইরাসই তা পারে না। আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে এটা ভিতরে ঢোকে এবং খুব সহজে ফুসফুসে ঢুকে যায়। কারণ, আমাদের ফুসফুসে এক ধরনের রিসেপ্টর রয়েছে, যেটাকে বলা হয় অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম। এই নোভেল করোনাভাইরাস ওই রিসেপ্টরকে চুম্বকের মতো আঁকড়ে ধরতে পারে। এই ভাইরাসের এমন একটা ক্ষমতা রয়েছে, যার

মাধ্যমে ওই রিসেপ্টরের গায়ে আঠার মতো সে লেগে যায়। আর এই ভাবে লেগে গেলেই সংশ্লিষ্ট কোষ ভাইরাসটাকে গিলে নেয়। গিলে নিলেই কোষের ভিতরে গিয়ে সে নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে থাকে, দ্রুত সংখ্যায় বাড়তে থাকে। সহজে সংক্রামিত হওয়ার এই ক্ষমতা এবং দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারা— এটাই সবচেয়ে মারাত্মক।

দ্রুত সংক্রামিত হলেই বা কী হবে? আপনি তো বলছেন হোস্টকে সে মারতে চায় না।

হ্যাঁ, মারতে চায় না। কিন্তু ২-৩ শতাংশকে তো মেরেও ফেলে। এ বার ভেবে দেখুন, যে ভাইরাস এত দ্রুত সংক্রামিত হতে পারে, সে তো কোটি কোটি লোককে খুব তাড়াতাড়ি সংক্রামিত করে ফেলবে। তার ২ শতাংশ বা ৩ শতাংশও যদি মারা যান, তা হলেও মৃত্যুর সংখ্যাটা কিন্তু বিরাট দাঁড়াবে। বিপদটা সেখানেই।

(ছবি: পিটিআই।)

https://www.anandabazar.com/others/science/covid-19-is-very-kind-still-number-of-deaths-can-be-overwhelming-exclusive-interview-dgtlx-1.1132478?ref=home-pq-stry-right-small-image-2